বাউল দর্শনে মানবতাবাদ : একটি পর্যালোচনা

এস.এম. ইকরামুল ইসলাম রাসেল*

সারসংক্ষেপ : মানবতাবাদ সম্পর্কিত আলোচনা দর্শনের ইতিহাসে অনেক দিনের। পাশ্চাত্য দর্শনে এ সম্পর্কে জোরালো আলোচনা পাই। পাশ্চাত্য দর্শনের বহু দার্শনিক বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে মানবতাবাদ সম্পর্কে নিজস্ব মতামত প্রদান করেছেন। মানুষের মূল্য, অধিকার, শান্তি রক্ষা ইত্যাদি চিন্তা থেকেই তাঁদের মধ্যে মানবতাবাদের ভাবনা এসেছে। বাঙ্গালি দর্শনের ইতিহাসেও বিভিন্ন মনীষীর আলোচনায় মানবতাবাদের কথা উল্লিখিত হয়েছে। যদিও সেসব বৈশ্বিক পর্যায়ে খুব কমই হয়েছে। সেই সূত্রে বলা যায়, বাউল দর্শন সম্পর্কিত আলোচনা আরও সীমিত। বাউল দর্শন হচ্ছে বাংলার লোকজ দর্শন। বাঙ্গালি দর্শনের ধারায় বাউল দর্শনেও মানবতাবাদের আলোচনা এসেছে। যদিও তা সরাসরি প্রকাশিত নয়। বাউলদের সাধনা, বিশ্বাস, গানে লুকিয়ে আছে তাদের মানবতাবাদের কথা। বাউলরা এই বাংলার নিজস্ব সম্পদ। বাউলদের মানবিকবোধ প্রকাশ পেয়েছে মানব মূল্য সম্পর্কিত তাদের বিশ্বাস, তাদের আচার, সাধনা, গান ইত্যাদির মাধ্যমে । এ থেকে মানবতাবাদের যে স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে, তাও এই বাংলারই সম্পদ। যা বাঙ্গালির দর্শন চিন্তাকে সমৃদ্ধ করেছে। এই কথাকে গুরুত্ব দিয়ে মানব-প্রাধান্য সম্পর্কিত তাদের মত যে সব সাধনার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, সেই সব সাধনার স্বরূপ বিশ্লেষণ সাপেক্ষে বাউল দর্শন যে মানবতাবাদী তা এ গবেষণায় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ : বাউল, শাস্ত্র-বিমুখ, গুরুবাদ, চারিচন্দ্রভেদ, মানব-প্রাধান্য এবং মানবতাবাদ।

ভূমিকা: বাউল বলতে আমাদের চোখে ভেসে উঠে গেরুয়া পোশাক পরিহিত, মাথায় জট বাঁধানো চুল, হাতে একতারা নিয়ে গেয়ে চলা এক মরমী সাধকের ছবি। চিরায়ত বাংলার অত্যন্ত পরিচিত এই ছবি একান্তই এই বাংলার। তাই তো বলা হয়, বাউল মত বাংলার ধর্ম, বাঙ্গালির ধর্ম, একান্ত ভাবেই বাঙ্গালির মানস ফসল [শরীফ, ২০১৩: ৪৫]। কিন্তু এই বাউল মতকে ধর্ম হিসেবে এবং তাদের গানকে সাহিত্যের অংশ হিসেবে ভাবতেই আমরা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। বাউল বিশ্বাস ও গানের মধ্যেও যে দার্শনিক ভাবনা থাকতে পারে,তা সাধারণত আমাদের চোখে পড়ে না। উল্লেখ্য, কথাটি সামগ্রিকভাবে বাঙ্গালির দর্শন চর্চার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে অনেক পণ্ডিতব্যক্তি মনে করেন। কারণ পাশ্চাত্য দর্শনের মত দার্শনিক চর্চা বাঙ্গালির মধ্যে নেই। বাঙ্গালি সাহিত্য চর্চায় এবং ধর্মীয় ভাবনায় যতটা পরিচিতি পেয়েছে, দর্শন চর্চায় ততটা পায়নি। কিন্তু এই ধর্মীয় তত্ত্ব ও সাহিত্য ভাবনা বিশ্লেষণে যে দার্শনিক চিন্তা পরিলক্ষিত হয়, তা অনেকের অগোচরেই থাকে। [ইসলাম, ১৯৯২:৯৫] বাউল মত একাধারে যেমন ধর্ম, তেমনি তা বাঙ্গালির দর্শন চিন্তারও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাংলায় বাউল মত ধর্ম হিসেবে বিবেচিত হলেও যৌক্তিক মন নিয়ে চিন্তা করলে তাতে দার্শনিক ভাব খুঁজে পেতে সমর্থ হবো। আর তখনই আমাদের উপলব্ধি হবে বাউল দর্শনে নিহিত মানবতাবাদ সম্পর্কে। মানব প্রেম ও মানব-প্রাধান্য সম্পর্কিত যে মানবতাবাদ, তার একটি বড় নিদর্শন হচ্ছে বাংলার বাউলদের দ্বারা সম্পাদিত সাধনা তথা বাউল দর্শন।

---

* সহকারি অধ্যাপক (দর্শন), সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

উদ্দেশ্য: বাউল জীবনে চর্চাকৃত যেসব সাধনা বা বাউল ধর্মের যেসব উপাদান নিয়ে বাউল দর্শন গঠিত, সেইসব সাধনা বা উপাদানের বিশ্লেষণের মাধ্যমে এদের মধ্যে নিহিত মানবতাবাদের স্বরূপ তুলে ধরাই আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি: আলোচ্য প্রবন্ধটিতে চিরায়ত গুণাত্মক তথ্য-বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এখানে অধ্যাপক ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বাউল সাধনা বা বাউল ধর্মের উপাদান সম্পর্কিত বিশ্লেষণমূলক মতকে প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা: মানবতাবোধের দৈন্যতা আজ চারিদিকে পরিলক্ষিত। মানব মর্যাদা আজ ভুলুণ্ঠিত। কিন্তু মানবমূল্য সম্পর্কিত ধারণা পরিষ্কারকরণের মাধ্যমে মানব মর্যাদা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। মানুষকে ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব তার যথার্থ অধিকার। মানবতাবাদ মানুষের মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করে। মানুষের অবস্থান যে সর্ব উচ্চে তা আমাদের সামনে তুলে ধরে। অলৌকিকতার স্থলে স্থান দেয় মানুষকে। যা দেখতে পাওয়া যায় বাউলদের জীবনাদর্শে। সেই সূত্রে বলা যায়, চিরায়ত বাংলার সম্পদ এই বাউল দর্শনে যে মানবতাবাদ সম্পর্কিত আলোচনা আছে তা সম্পর্কে জানা ও উপলব্ধি করা আজ বিশেষ প্রয়োজন। আর তাই বাউল দর্শনে মানবতাবাদ নিয়ে এই প্রবন্ধটি গবেষণার দাবি রাখে।

সাহিত্য পর্যালোচনা: যে কোন গবেষণার ক্ষেত্রে সাহিত্য পর্যালোচনা একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের নিমিত্তে কিছু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ সকল গ্রন্থের ও প্রবন্ধের রচয়িতাগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাউল ধর্ম ও সাধনা তথা বাউল দর্শন সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব মত তুলে ধরেছেন।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (ভট্টাচার্য, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ) প্রায় বিশ বৎসর বাংলার বিভিন্ন বাউল সম্মেলন ও আখড়া ঘুরে বাউল মত ও বাউল গান সংগ্রহ ও গবেষণা করেছেন। তাঁর সেই গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বাউল মতের উদ্ভব, বাউল ধর্মের উপাদান, বাউল ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সম্পর্ক, বাউল গান প্রভৃতি আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন এবং বাউল দর্শন বুঝতে সাহায্য করেছেন।

মোঃ সোলায়মান আলী সরকার (সরকার, ১৯৯২) বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিভিন্ন বাউল গবেষকের মত সমালোচনা এবং প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করার মাধ্যমে সমগ্র বাউল দর্শন সম্পর্কিত তাঁর নিজস্ব মত আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

আহমদ শরীফ (শরীফ, ২০১৩) বাউল তত্ত্বের উৎসের আলোকে ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও বর্তমানে তত্ত্বটির অবস্থা উল্লেখপূর্বক তত্ত্বটি সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ব্যখ্যা প্রদানের চেষ্টা করেছেন।

মুহাম্মদ এনামুল হক (হক, ২০১৫) মূলত বঙ্গদেশে (বাংলায়) সূফিদের উদ্ভব ও প্রভাব নিয়ে আলোচনা করলেও স্বল্প পরিসরে বাউল মতের উদ্ভব, বাউলদের স্বরূপ, বিভিন্ন শতাব্দীতে বাউল মতের পর্যালোচনা ও বাউলদের উপর সূফী প্রভাব নিয়ে আলোচনা করছেন।

হাসনা বেগম (বেগম, ১৯৯২) বাউল দর্শনের সামগ্রিক রূপটি সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করার মাধ্যমে বাউল দর্শন সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

সুধীর চক্রবর্তী (চক্রবর্তী, ২০০২) বাউল সাধনার যে রহস্যময় জগৎ, তা স্বয়ং প্রত্যক্ষণ করেছেন। বাউলদের সাথে মিশেছেন বাউলদের মতো করেই। ফলশ্রুতিতে প্রাপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে বাউল গূঢ় তত্ত্বাবলী

অত্যন্ত সহজ ভাষায়, সাবলীলভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। ব্যাখ্যা করেছেন তত্ত্বের পেছনে নিহিত তাদের মনোভাব ও সামাজিক বাস্তবতা।

মানবতাবাদঃ পাশ্চাত্য দর্শনের বহু দার্শনিক বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে মানবতাবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের দিকে গ্রিক দার্শনিক প্রোটোগোরাসের আলোচনায় মানবতাবাদের কথা পরিলক্ষিত হয়। মানবতাবাদের জনক হিসেবে পরিচিত প্রোটোগোরাস বলেন, মানুষ হচ্ছে সবকিছুর পরিমাপক (Man is the measure of all things) [Russell, 1996: 94]। পরবর্তীতে এরিস্টটলের চিন্তা ভাবনায়ও মানবতাবাদের ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রিসে ডেমোক্রিটাস, লিউসিপাসের দর্শনে জড়বাদী মানবতাবাদের ধারণা পাওয়া যায়। আধুনিক কালে জড়বাদী মানবতাবাদের অন্যতম সমর্থক ছিলেন টমাস হবস, ল্যা ম্যেটরিক, হেলভিটাস ও অন্যান্য দার্শনিক। দার্শনিক স্পিনোজা, ডিউই, র‍্যানডাল ও চার্লস ডারউইনের দর্শনেও মানবতাবাদী চিন্তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের দার্শনিক অগাষ্ট কোঁত, ব্রিটিশ দার্শনিক জেরেমি বেনথাম, জেমস মিল ও জন স্টুয়ার্ট, জার্মান দার্শনিক আরনস্ট হেকেল, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, কার্ল মার্কস ছিলেন মানবতাবাদী দার্শনিক। উনবিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত বিভিন্ন ধর্মীয় আন্দোলনও মানবতাবাদী দর্শনের প্রচারে সহায়ক হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতে জ্যাঁ পল সার্তের হাত ধরে ফ্রান্সে বিকাশ ঘটেছিল অস্তিত্ববাদী মানবতাবাদ [রায়, ২০১৭: ২৬০,২৬১]।

পাশ্চাত্যের মতো প্রাচীন বাংলায়ও জড়বাদী মানবতাবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে আধ্যাত্মিক মানবতাবাদের বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হলেও, এই ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের কথায় আধুনিক মানবতাবাদের ছায়া দেখতে পাই। উল্লেখ্য, প্রাচীন গ্রিসের প্রোটোগোরাসের পূর্বে গৌতম বুদ্ধ মানবতাবাদের প্রচার করেছেন। ইসলামের প্রসারের সাথে সাথে বাংলায় ধর্মীয় মানবতাবাদের প্রসার ঘটে। বৈষ্ণববাদেও আধ্যাত্মিক মানবতাবাদের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাংলার উল্লেখযোগ্য মানবতাবাদী হিসেবে ডিরোজিও, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ পরিচিত ছিলেন। মুসলিম সাহিত্য সমাজের সদস্য আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেন, আনুয়ারুল কাদের, এ.জেড.এম. নূর মোহাম্মদ, আব্দুল কাদির, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, মোতাহার হোসেন চৌধুরী প্রমুখ ছিলেন এদেশে মানবতাবাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রচারক। গৌতম বুদ্ধ ও বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় প্রভাবিত ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব ছিলেন বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত মানবতাবাদী [রায়, ২০১৭: ২৬৩-২৬৬]।

মানবতাবাদ হচ্ছে মানবকেন্দ্রীক দর্শন। এটি একটি ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শ যা অলৌকিক ও ঐশী কর্তৃত্বকে অস্বীকার করা বোঝায়। মানুষের জীবনের সাথে সম্পর্কিত সবকিছু কেমন হবে, তা কোনো অলৌকিক কিছু নয়, বরং কেবল মানুষই নির্ণয় করবে। দর্শনের ইতিহাসে মানবতাবাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা পরিলক্ষিত হয়। মানবতাবাদকে ব্যাখ্যা করতে যেয়ে Corliss Lamont বলেছেন, মানবতাবাদ মানুষের উপর পূর্ণ আস্থা রেখে এটা বিশ্বাস করে যে, মানুষ সাহসিকতা ও দূরদৃষ্টি প্রয়োগের সাথে সাথে যুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর প্রাথমিক আস্থা স্থাপনের মাধ্যমে নিজস্ব সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বা সম্ভাবনার অধিকারী [Lamont, 1997: 14]। মানবতাবাদকে সংজ্ঞায়িত করতে যেয়ে Andrew Copson বলেন, মানবতাবাদ হচ্ছে একটি গণতান্ত্রিক এবং নৈতিক জীবনের ভঙ্গিমা যা ঘোষণা করে যে, নিজস্ব জীবনকে অর্থপূর্ণ করার এবং আকার দেয়ার অধিকার ও দায়িত্ব মানুষের রয়েছে। মানবতাবাদ এটি বিশ্বাস করে যে, একটি মানবিক ও অন্যান্য প্রাকৃতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে, মানুষের যৌক্তিক মনোভাব এবং মানবিক গুণাবলী

দ্বারা প্রাপ্ত মুক্ত চিন্তার মাধ্যমে একটি অধিকতর নৈতিক মানবীয় সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এটি ধর্মীয় নয় এবং এটি বাস্তবতার কোন অলৌকিক ধারণা গ্রহণ করে না। [Copson, 2015: 06] ।

এক সময় বাংলার পথে-প্রান্তরে বাউল সাধকদের পদচারণা দেখা যেত। তাদের গান আমাদের মনকে বিমোহিত করত। কিন্তু কালে কালে আজ তা বিলুপ্তির পথে। ক্ষুদ্র পরিসরে আজ তাদের চর্চা অব্যাহত। আধুনিক এই যান্ত্রিক যুগে তাদের একতারা বাজানো গান মানুষের মনকে পূর্বের মত আকর্ষিত না করলেও জ্ঞানানুরাগীদের তাদের গান, সাধনা ইত্যাদি অনুষঙ্গে লুকায়িত যে দার্শনিক তত্ত্ব তা আকর্ষিত করে। বাংলার অধিকাংশ মানুষের কাছে বাউলরা অশিক্ষিত, অসামাজিক, পাগল ইত্যাদি হিসেবে পরিচিত। তাদের জীবনাচার যে দর্শনের অংশ হতে পারে তা অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য। কিন্তু এটাই সত্যি যে, বাংলার এই অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত, একতারা আশ্রয়ী, ভাবদ্রোহী গায়ক, স্বাধীন ও সমন্বয়মূলক মরমী সাধকদের আত্মোপলব্ধিমূলক চিন্তাধারার মাধ্যমে যে দর্শন গড়ে উঠেছে, তাই বাউল দর্শন [সরকার, ১৯৯২:৩৭]। বাউল মতের উন্মেষ কখন থেকে সে সম্পর্কে একেবারে সঠিক সময় উল্লেখ করা না গেলেও অনুমান করা হয় যে, সতের শতকের দ্বিতীয় পর্ব থেকেই বাউল মতের উদ্ভব। মুসলমান মাধব বিবি ও আউল চাঁদ এ মতের প্রবর্তক বলে বাউল সম্প্রদায় বিশ্বাস করে। মাধব বিবির শিষ্য নিত্যানন্দ এর পুত্র বীরচন্দ্র বা বীরভদ্রই বাউল মতকে আরো জনপ্রিয় করে তোলেন। আর উনিশ শতকে এসে বাউল সম্রাট লালন ফকিরের সাধনা ও সৃষ্টির মাধ্যমে বাউল মতের পরিপূর্ণ বিকাশ হয় [শরীফ, ২০১৩:৫২]। জাতিতে মুসলমান ও হিন্দু সাধকদের সাধনার সমন্বয়ে যে বাউল মত গড়ে উঠেছে তা অসম্প্রদায়িক ও বর্ণবৈষম্যহীন। বাউলরা গানের মাধ্যমে তাদের মত প্রচার করে বেড়িয়েছেন বাংলার পথে-প্রান্তরে। বিভিন্ন উপমা ও রূপকাশ্রিত ভাবে তাদের চিন্তা তারা গানে প্রকাশ করেছেন বিধায় সুস্পষ্ট বাউল চিন্তাকে তা প্রকাশ করে না। বাউল চিন্তা, তাদের জীবন দর্শনের তত্ত্ব কে তাই তাদের সাধন পদ্ধতির মূল উপাদান থেকে অনুমান করে নিতে হয় [বেগম, ১৯৯২: ১২২]। বাউল সাধকদের পালনকৃত সাধন পদ্ধতির মূল উপাদান থেকে অনুমিত বাউল চিন্তাকে যদি নৈতিক দিক থেকে বিচার করি তবে তাতে মানবতাবাদের চরম ও পরম প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই- এটাই মানবতাবাদের মূল কথা। আর এই উক্তির উৎকৃষ্টতম প্রকাশ ঘটে বাউল চিন্তা ভাবনায়। এই প্রকাশ ঘটেছে বাউল শাস্ত্র-বিমুখতায়, তাদের গুরুবাদে এবং চারিচন্দ্রভেদ সাধনায় [বেগম, ১৯৯২: ১২৬]।

শাস্ত্র-বিমুখঃ বাউলরা মূলত শাস্ত্র-বিমুখ। তাদের সাধন পদ্ধতির সাথে শাস্ত্রের কোন যোগ নেই। শাস্ত্র বলতে বাউল দর্শনে বেদকে বুঝানো হয়েছে। বাউল দর্শন মূলত বেদ বিরোধী দর্শন। তারা যে আচার পালন করেন তা রাগের আচার হিসেবে পরিচিত। তা বেদের আচার নয়। অর্থাৎ বেদের বিধি বাউলরা মেনে চলে না। বেদ-বিধি বলতে বাউলরা মূলত চিরাচরিত আনুষ্ঠানিক ধর্মকে নির্দেশ করেছেন বলে ধারণা করা হয়। চিরাচরিত আনুষ্ঠানিক ধর্ম বলতে সাধারণত প্রচলিত যে ধর্ম বিশ্বাস, তাই নির্দেশ করা হয়েছে। বাউলদের মধ্যে বৈষ্ণব-হিন্দু ও মুসলিম-এ দু'টি ধারা বিদ্যমান, যারা পূর্বে সহজিয়া বৌদ্ধ ছিল। তাই চিরাচরিত আনুষ্ঠানিক ধর্ম বলতে ইসলাম, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মকেও বোঝানো হতে পারে। যেহেতু বাউলরা এই চিরাচরিত আনুষ্ঠানিক ধর্ম মানে না, তাই বাউল আচারকে ধর্ম হিসেবে উল্লেখ করলেও তাকে অবশ্যই চিরাচরিত আনুষ্ঠানিক ধর্মের কাতারে ফেলা যাবে না। অবশ্যই তা বেদ-বহির্ভূত ধর্ম হিসেবে গৃহীত হবে। চিরাচরিত আনুষ্ঠানিক ধর্মকে বাউলরা বর্জন করেছে, কারণ বাউলরা বিশ্বাস করে এই সব ধর্ম আমাদের প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। মানব জীবনের যে মূলতত্ত্ব তাও আনুষ্ঠানিক ধর্ম নির্ণয় করতে পারে না। এসব ধর্ম মূলতঃ বিভিন্ন অর্থহীন অনুষ্ঠানাশ্রয়ী বলে বাউলরা মনে করে। এই সব অর্থহীন অনুষ্ঠান

একদিকে যেমন আমাদের প্রকৃত সত্যের সন্ধান দিতে ব্যর্থ, তেমনি অন্যদিকে চারদিক থেকে আমাদের আবদ্ধ করে রেখেছে। যার ফলে প্রকৃত জ্ঞানের সূর্য আমাদের সামনে উদিত হতে ব্যর্থ হয়। সবাই এই সব ধর্ম নিয়েই ব্যস্ত। ফলশ্রুতিতে প্রকৃত ধর্ম কি হবে তাও কেউ সন্ধান করে দেখার প্রয়োজন বোধ করছে না বলে বাউলরা মনে করে। লালনের একটি গানে বলা হয়েছে,

"কার বা আমি কে বা আমার,
আসল বস্তু ঠিক নাহি তার,
বৈদিক মেঘে ঘোর অন্ধকার,
উদয় হয় না দিনমণি ॥" [ভট্টাচার্য, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ: ২৯১]।

তাছাড়া বেদ বা অন্য কোন চিরাচরিত আনুষ্ঠানিক ধর্ম যেসব পণ্ডিতগণ পালন করেন, মেনে চলেন, তাঁরা এইটা জানেন না যে মানুষ ভজনই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ভজন। অর্থাৎ মানুষের দেহকে আশ্রয় করে যে ভজন করা হয়, তাই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত। আর মানুষের দেহাশ্রিত এই ভজনই হচ্ছে রাগের আচার। এই দেহবাদই বাউল সাধনতত্ত্ব বা দর্শন। লালন বলেন,

"বেদে কি তার মর্ম জানে,
যেরূপ সাঁইর লীলা-খেলা
আছে এই দেহ-ভুবনে ॥
পঞ্চতত্ত্ব বেদের বিচার
পণ্ডিতেরা করেন প্রচার,
মানুষ-তত্ত্ব ভজনের সার
বেদ ছাড়া বৈ রাগের মানে ॥" [ভট্টাচার্য, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ: ২৯৩]।

বাউলরা কোন ঐশী শাস্ত্র বা কোন নবীর উপর প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না। তারা এ ধরনের শাস্ত্র ভিত্তিক কোন ধর্ম বা সমাজ ব্যবস্থার উপর আস্থা স্থাপন করে না। কারণ তারা মনে করে এই সবই দলীয় চেতনাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু বাউলরা কখনো সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও দল চেতনাকে গ্রহণ করতে চায় না। অসম্প্রদায়িক বিশ্বাসে বিশ্বাসী বাউল সম্প্রদায়ের লক্ষ্য জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কেবল মানুষকে জানা, মানুষকে মানা ও শ্রদ্ধা করা। তারা মানুষের ভেতরে যে মনের মানুষ বাস করে তাকে খুঁজে পেতে চায় [সরকার, ১৯৯২: ১৯৫]। সেজন্যই কোন দূর পর্বতে কৃচ্ছ্রসাধনার মাধ্যমে দীর্ঘ সাধনা করে বা শাস্ত্রে যে পন্থার উল্লেখ আছে তা অনুসরণ করে কোন নির্জীব মূর্তির মধ্যে 'সাঁই' এর খোঁজ বাউলরা করে না। কারণ তিনি মানুষের মনের মধ্যেই আছেন। যারা নিজেদের মর্ম দ্বারা একথা উপলব্ধি করতে পারে না, তারাই শাস্ত্র নি:সৃত পথে ধাবিত হয়। কিন্তু কোন কূল খুঁজে পায় না। বাউলরা তাদের গানে বলেন,

"আছে তোরই ভিতর অতল সাগর
তার পাইলি না মরম।
তার নাই কূলকিনারা শাস্ত্র ধারা
নিয়ম কি করম ॥" [হক, ২০১৫: ১৩৫]

বাউলরা প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্র অস্বীকার করে। কিন্তু তার অর্থ এটা বোঝায় না যে, তারা কোন ধর্ম স্বীকার করে না। তারা নিজেরা না মানলেও সব ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করে [সরকার, ১৯৯২: ১৯৬]। সকল ধর্মেরই একটি সার বা মূল বক্তব্য থাকে। আর সেটা হচ্ছে আত্মার মুক্তি। বাউলরা সেই সার কথাকে স্বীকার করে এবং শ্রদ্ধা করে। বাউল মতবাদ কোন প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্র ভিত্তিক মতবাদ নয়। তা সত্ত্বেও বাউল মতবাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সব ধর্মের মধ্যে নিহিত এই সার বা মূল কথার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। [সরকার, ১৯৯২: ১৯১]।

বাউলরা এ মতে বিশ্বাস করে যে, তত্ত্বের জন্য মানুষ নয়। তারা এটাও বিশ্বাস করে যে, মানুষের জন্যও তত্ত্ব নয়। তাদের এই বিশ্বাসের কারণ হিসেবে বলা যায়, বাউলরা মনে করে মানুষ কোন তত্ত্ব বা শাস্ত্রের অধীন হতে পারে না। শাস্ত্র মানুষের দ্বারা তৈরী হতে পারে, আবার তা ঈশ্বর প্রদত্ত হতে পারে। কিন্তু কোন শাস্ত্রই মানুষের উপর স্থান পেতে পারে না। তাই শাস্ত্রকে পরম মানা মানুষের উচিত নয়। পাশাপাশি বাউলরা এটাও বিশ্বাস করে যে, শাস্ত্র প্রণয়ন করাও মানুষের কাজ হতে পারে না। মানুষের একমাত্র কাজ নিজেকে জানা। নিজেকে পরিপূর্ণভাবে জানতে পারলে এবং তা উপলব্ধি করতে পারলেই কেবল মানুষ প্রকৃত আত্মার সন্ধান পেতে পারে [বেগম, ১৯৯২: ১২৬]। এ প্রসঙ্গে বাউল পদ্মলোচন বলেন,

"ও সে বেদের করণ উলট-পালট ক'রে
নতুন পথের খবর দিয়েছেন মোদের
জীবে লাগিয়া ধান্দা
করিল বান্দা
বস্তা বন্দী বেদ-পুরাণের ॥" [ভট্টাচার্য, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ: ২৯৫]।

বাউলরা যেমন শাস্ত্র-বিমুখ, তেমনি তাদের নিজস্ব কোন শাস্ত্র নেই। তারা নিজেরা কোন শাস্ত্র রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেনি এমন বাউলের সংখ্যাই অধিক এবং তারা নিম্নবর্ণের হিন্দু বা ধর্মান্তরিত মুসলমান। এইসব বাউলদের নিজস্ব কোন লিখিত শাস্ত্র, ইতিহাস বা দর্শন নেই। তারা কোন প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে না। কোন প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে মনে হয় তারা ইচ্ছুকও নয়। এর কারণ যদি অনুসন্ধান করতে যাই, তবে প্রধান কারণ হিসেবে পাব পুরাতন বৈষম্যমূলক শাস্ত্রের প্রতি অনাস্থা। এজন্যই তাদের মধ্যে নতুন শাস্ত্র প্রণয়নে অনীহা দেখতে পাই। তারা মনে করে মানুষের হাতে যে শাস্ত্র তৈরী, তাতে মানুষেরই বন্দি হবার আশঙ্কা প্রবল থাকে। এসবই বাউলদের শাস্ত্র বিমুখ করেছে [বেগম, ১৯৯২: ১১৫]।

এজন্যই লালন বলেন,

"... মনে নিষ্ঠা হলে মিলবে তারি
ঠিকানা।
বেদ-বেদান্ত পড়বে যত বাড়বে তত
লক্ষণা ॥" [ভট্টাচার্য, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ: ৩৪১]

বাউলদের এই যে শাস্ত্র বিমুখতা এবং শাস্ত্রের যে অর্থহীনতা, তা বাউলরা কেবল নিজেদের বিশ্বাসের মধ্যে আবদ্ধ রাখে না, বরং গানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছেও প্রচার করে। নাথপন্থি, উদার

মানবতাবাদী ও ইহজাগতিক মরমী অধ্যাত্মবাদী বাউলরা সমগ্র বাংলার পল্লীতে উদাত্ত কণ্ঠে মরমী গান গেয়ে বর্ণবৈষম্য ও শাস্ত্রমুখীতার অর্থহীনতা প্রচার করে [বেগম, ১৯৯২: ১২৩]।

গুরুবাদ: ভারতের কোন ধর্মই কেবল তাত্ত্বিক রূপ নিয়ে গড়ে উঠেনি। এখানে তত্ত্বের পাশাপাশি বাহ্য ক্রিয়ারও গুরুত্ব অপরিসীম। এই বাহ্য ক্রিয়ার মাধ্যমে সমর্থিত তত্ত্বই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে, আধ্যাত্মিক সত্য রূপে প্রকাশিত হয়েছে। তাই বলা যায়, ভারতের প্রত্যেক ধর্মের তত্ত্বীয় দিক ব্যতীত একটি ব্যবহারিক দিকও রয়েছে। এই ব্যবহারিক দিক সাধনার মাধ্যমে সেই ধর্মের মধ্যে নিহিত সত্য উপলব্ধি করা যায়। যারা এইসব ক্রিয়া সাধনা করার মাধ্যমে নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে সেইসব আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধি করেছেন, তারাই গুরু বলে পরিচিত। গুরু নিজের অভিজ্ঞতা উপলব্ধির আলোকে অন্যকেও সে পথে পরিচালিত করতে পারেন। সেই আধ্যাত্মিক সত্যের মুখোমুখি এবং উপলব্ধি করাতে পারেন। গুরু ব্যতীত যা কোনভাবেই সম্ভব নয়। এজন্যই ভারতীয় ধর্ম সাধনায় গুরুর এত প্রাধান্য। বৈদিক যুগ হতে ভারতের ধর্মে গুরু ও শিষ্যের যে পরম্পরা, তা চলে আসছে। যে সব ধর্মে তাত্ত্বিক দিক থেকে ব্যবহারিক কর্মের প্রাধান্য বেশি থাকে, সেইসব ধর্মে গুরুর প্রয়োজনীয়তাও বেশি থাকে। তান্ত্রিক ধর্মীয় আচারের ভিত্তিই কর্ম। ব্যবহারিক সাধনাই এর মূল। এই ব্যবহারিক বা সাধনকর্মে যে সব গূঢ় পদ্ধতি, যোগ-সাধনা অনুসরণ করতে হয় তা গুরুর উপদেশ ও সাহচর্য ব্যতীত কোনভাবেই সম্ভব নয়। তন্ত্রধর্মে গুরু ব্যতীত কোনভাবেই সামনে অগ্রসর হওয়ার উপায় নেই। হিন্দু, বৌদ্ধ, নাথ ইত্যাদি তান্ত্রিক ধর্মে গুরুর প্রাধান্য অপরিসীম। কারণ এসব ধর্ম গুরু সাধনাকে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। একই কারণে বাংলায় যে সূফী সম্প্রদায় তাদের মধ্যেও গুরুর স্থান আছে এবং তা অতি উচ্চে [ভট্টাচার্য, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ: ৩০৩]। বাংলার এমনই বিভিন্ন গুরুবাদী সম্প্রদায় অর্থাৎ সিদ্ধা, সূফী, যোগী, বৈষ্ণবদের মত বাউলরাও গুরুবাদী [শরীফ, ২০১৩: ৫৪]। বাউল সম্প্রদায়ের এই গুরুবাদী মতবাদ বাংলার অন্যান্য গুরুবাদী সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ধ্যান ধারণা রয়েছে তাদের মিশ্রণে গড়ে উঠেছে। বাংলার বাউল সম্প্রদায়ের প্রত্যেকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র চিন্তার অধিকারী। কিন্তু প্রত্যেকে পৃথক চিন্তাশীল ব্যক্তি হলেও তাদের চিন্তার মধ্যে অসামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং একটি আশ্চর্য সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। পৃথক চিন্তাশীল বাউলদের সামঞ্জস্যপূর্ণ চিন্তার মাধ্যমে বাউল মতবাদ গড়ে উঠলেও, তা বাংলায় প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য গুরুবাদী সম্প্রদায়ের প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারেনি। কারণ আচারে কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও মূলতত্ত্ব প্রত্যেকেরই কাছাকাছি। তাই বাউলদের যিনি গুরু, তিনি হিন্দুদেরও গুরু। তাছাড়া বাউলরা বৌদ্ধ সহজিয়া মত ত্যাগ করে বৈষ্ণব ও মুসলিম মত গ্রহণ করেছিল বিধায়, এই তিন মতের আচারও তাদের মধ্যে লক্ষণীয়। সূফীদের সাথে বাউল মতের আচারে পার্থক্য থাকলেও উভয়ই গুঢ় তত্ত্বানুসন্ধানী। তাই সূফী তত্ত্বের অনেক কথাও বাউল গানে আমরা খুঁজে পাই। এসব থেকে এই ধারণায় উপনীত হতে পারি যে, বাংলার বৌদ্ধ, হিন্দু, বৈষ্ণব, কর্তাভজা, সূফী প্রভৃতি যোগ তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের প্রভাবের ফলে বাউলদের ভেতরে গুরুভক্তি স্থান পেয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাউলদের যে গুরুবাদ তার সাথে ভারতীয় ও পারস্যবাসী যে সব সূফীগণ আছেন তাদের গুরুবাদের যথেষ্ট মিল আছে। আরবীয় সূফিবাদ বা আরবীয় ইসলাম ধর্মের সাথে বাউল গুরুবাদের তেমন কোন সম্পর্ক নেই। যেহেতু বাউল গুরুবাদ বাংলার বিভিন্ন গুরুবাদী সম্প্রদায়ের প্রভাবে গড়ে উঠেছে, তাই বলা যায় বাউল গানে ব্যবহৃত গুরু, মুরশীদ, পীর, ফকির, দরবেশ, ওলী ইত্যাদি শব্দ বাহ্যিকভাবে আমাদের কাছে হেঁয়ালিপূর্ণ ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হলেও এর ভিতরকার যে যোগসূত্র আছে তা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে এক [সরকার, ১৯৯২: ২০০, ২০১]।

বাউলদের কাছে গুরুর স্থান অনেক উচ্চে। বাংলার বাউলরা গুরুকে তাদের অন্তরে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে থাকে। বাউলদের কাছে গুরু একরূপে নয়, বরং দ্বৈতরূপে প্রকাশিত। তারা তাদের গুরুকে যেমন মানবগুরু রূপে দেখে, তেমনি গুরুকে পরমতত্ত্ব রূপেও দেখে। বাউলদের গানে গুরুর এই দুই রূপেরই প্রকাশ পাওয়া যায়। বাউলরা বিশ্বাস করে যদি মানব গুরুর প্রতি যথাযথ ভক্তি নিষ্ঠা না প্রদর্শন করা হয়, তবে পরমতত্ত্বরূপী গুরুর সন্ধান পাওয়া যায় না। বাউলরা মানবগুরুকে সেই পরমতত্ত্বরূপী গুরুর প্রতিনিধি রূপে মেনে চলে। গুরুর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন বাউলরা যেভাবে করে থাকে, বাংলার অন্যান্য গুরুবাদী সম্প্রদায়ের মধ্যে সেইরকম ভক্তির উপস্থিতি কতটুকু তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করা যায়। কখনো কখনো বাউলদের গুরুর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার যে নিদর্শন তা দেখে হাস্যকর ও বিচারবিহীন মনে হলেও গুরু ও শিষ্যের মধ্যে স্থিত বন্ধনের যে দৃঢ়তা তা অন্য কোন গুরুবাদী সম্প্রদায়ের মধ্যে পাওয়া দুষ্কর । বাউলদের গুরু তাদের একাধারে যেমন পরমার্থিক বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন, তেমন ব্যবহারিক ক্রিয়ার বিষয়েও দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। পাশাপাশি শিষ্যদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ ঘটলেও তার সমাধান গুরুই করে থাকেন। গুরু তাদের কাছে এতই ভক্তির পাত্র যে প্রকৃতি-পুরুষ ঘটিত যে যোগ সাধনা বাউলরা করে থাকে, সেই সময়ও গুরুর উপস্থিতি এবং কখন, কিরূপে, কোন ক্রিয়া করতে হবে তার দিক নির্দেশনা বাউলরা কামনা করে। গুরু সেখানে উপস্থিত থেকে সে উপদেশও দান করেন। গুরু-শিষ্য কারও মধ্যে কোনো রকম কুণ্ঠা ও সংকোচবোধ বিন্দুমাত্র থাকে না। শিষ্যের অন্তঃজীবন ও বহিঃজীবন উভয়ই গুরুর নিকট সবসময় প্রকাশিত। কারণ বাউলরা বিশ্বাস করে, গুরুই হচ্ছেন এ জগতে তাদের পরম সম্পদ এবং যে পরমতত্ত্বের সন্ধান তারা আত্মোপলব্ধি করতে চায় সেই পরমতত্ত্ব মানবগুরুর রূপে শিষ্যকে সাধন পথে পরিচালিত করছেন। লালন বলেন,

"মুরশিদ বিনে কি ধন আর আছে রে এ জগতে
মুরশিদের চরণ সুধা
পান করিলে হরে ক্ষুধা,
কোরো না দেলে দ্বিধা
যেহি মুরশিদ সেহি খোদা।
বোঝ 'অলিয়ম মরশেদা'
আয়েত লেখা কোরানেতো॥
আপনি খোদা আপনি নবী
আপনি সেই আদম ছবি
অনন্তরূপ করে ধারণ;
কে বোঝে তার নিরাকরণ
নিরাকার হাকিম নিরঞ্জন
মুরশিদ-রূপে ভজন পথে ॥" [ভট্টাচার্য, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ: ৩০৪, ৩০৫]।

বাউলরা মনে করেন দেহের সারবস্তু হচ্ছে বিন্দু এবং এই বিন্দুই হচ্ছে মানুষের পরমসম্পদ। এই বিন্দু হচ্ছে শ্রীগুরু বা পরমতত্ত্বের স্বরূপ। তাই এই বিন্দু বা গুরুধনকে সযত্নে রক্ষা করে বাউলদের চলতে হবে। পরম এই বিন্দু বা গুরুবস্তু দিয়ে মানুষকে এই সংসারে পাঠিয়েছেন। এই বিন্দু হচ্ছে মানুষের চলার পাথেয়। একে রক্ষা করে চলতে হবে। যদি হারিয়ে যায় তবে মানুষ পরমসত্তা থেকে দূরে সরে যাবে। মানুষ এই জগৎ সংসারে নানা রিপুর তাড়নায়, সাময়িক উত্তেজনায় সেই গুরু বস্তু হারিয়ে ফেলে। তাতে তাদের সাধনা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। উত্তরবঙ্গের বাউল গোবিন্দ বলেন,

"...হ'ল না রে মোর সাধন করা,
কি গুণে সাঁই দিবে ধরা,
হারাইয়াছি গুরুর বস্তু-ধন।" [ভট্টাচার্য, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ: ৩০৭]।

মানবগুরু এই বিন্দু রক্ষার জন্য উপদেশ দেন, দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। এই যে বিন্দু তা রক্ষাই বাউল সাধনার মূলভিত্তি। আর এ বিন্দু রক্ষায় গুরুর যে নির্দেশ, তাই হচ্ছে সাধন-নির্দেশ [ভট্টাচার্য, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ: ৩০৭]। বাউলদের মতে এই যে বিন্দু ধারণের সামর্থ্য, এটাই সিদ্ধির প্রকৃত নিদর্শন। বাউলরা মনে করে যদি সঠিক কোন গুরুর কাছে দীক্ষা না নেওয়া হয়, তবে সাধনার মাধ্যমে এই সিদ্ধি বাউলরা অর্জন করতে পারে না [শরীফ, ২০১৩: ৪৩]। বাউলদের সাধন-ভজনে গুরু তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাউলরা বিশ্বাস করে গুরু যদি অসন্তুষ্ট হয়, তবে তাদের ইহকাল ও পরকাল উভয় জীবনই অর্থহীন ও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। গুরুকে তুষ্ট রাখা তাই বাউল সাধনারই অঙ্গ [খালেদউজ্জামান, ২০১৪: ৫৪]।

বাউলদের মতে, এই গুরুতত্ত্ব হচ্ছে আত্মতত্ত্ব ও পরমতত্ত্বের মিলিত রূপ। কৃষ্ণকে তারা পুরুষতত্ত্ব, রাধাকে প্রকৃতিতত্ত্ব বলে নির্দেশ করে এবং উভয়ের গভীর মিলনেরই নাম গুরুতত্ত্ব। এই গভীর প্রেমের মাধ্যমে যে অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভূত হয়, তাকেই বাউলরা বলে মহাভাব। এই মহাভাবই হচ্ছে প্রেমের চরম ও পরম অবস্থা। বাউল মত বিশ্বাস করে এই অপূর্ব, আনন্দময় সত্তাই হচ্ছে মানবাত্মা। যাকে প্রকৃত গুরুর স্বরূপ বলে বাউলরা মেনে নেয়। বাউলরা যে সাধনায় নিজেদের আত্মনিয়োগ করে তা হচ্ছে মানবাত্মার এই স্বরূপ উপলব্ধির সাধনা। এজন্যই গুরুতত্ত্বকে অনেক সময় বাউলরা চৈতন্যতত্ত্ব বলে [ভট্টাচার্য, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ: ৩১২]।

বাউলরা তাদের গুরুকে ভক্তি করে, সাধনার পূর্ণতার জন্য গুরুর উপর নির্ভর করে। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা তাদের অপরিসীম। তবে এ কথার অর্থ এই নয় যে, গুরুর পদে সাধক নিজেকে পরিপূর্ণরূপে আত্মবিলোপ করে দিবে। গুরু যতক্ষণ সহজভাবে তাদের আত্মিক ক্ষুধা মেটাতে সাহায্য করে, ততক্ষণ বাউলরা গুরুর প্রাধান্য স্বীকার করে। কিন্তু গুরু যদি বাউল হৃদয়ে উত্থাপিত সহজ সরল সত্য উপলব্ধি করাতে ব্যর্থ হয়, অন্তরাল সৃষ্টি করে, তবে বাউলরা গুরুকে অস্বীকার করে [হক, ২০১৫: ১৩৯]। তাই বলা যায়, বাউলরা তাদের সাধন ভজনের সহায়ক হিসেবে গুরুকে চায়, গুরুকে ভক্তি করে। কিন্তু সেজন্য গুরুর মধ্যে নিজেকে আত্মবিলীন করে না দিয়ে, বরং নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রাখে।

চারিচন্দ্রভেদ: এই মানব দেহ ও মানব জীবনকে বাউলরা পরম সম্পদ বলে মনে করে। সাধনা মূলত দেহকে আশ্রয় করে হয়ে থাকে বলে বাউলরা বিশ্বাস করে। সাধারণ মানুষ দেব-দেবীর অস্তিত্ব স্বীকার করে। কিন্তু বাউলরা বলে, দেব-দেবীর অস্তিত্ব অনুমানের মাধ্যমে স্বীকার করতে হয়। এ সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই। এছাড়া মানুষ যে বিশ্বাস করে পূজা, ধ্যান,জপ করার মাধ্যমে স্বর্গ লাভ হয় বা পরকালে উত্তম ফল লাভ করা যায়, তা বাউলদের নিকট বিশ্বাসযোগ্য নয়। বাউলরা বিশ্বাস করে মূলতত্ত্ব আত্মা বা ভগবান যদি কোথাও বাস করে থাকে, তবে তা মানবদেহেই। তাই এই মানব দেহকে ভিত্তি করে সাধন-ভজন করার মাধমে পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করাই বাউল সাধকদের লক্ষ্য। মানব দেহকে আশ্রয় করে যে সাধনা তাতেই তাদের বর্তমান নিহিত। মানব জীবন আছে বলেই মানব দেহকে লাভ করা গিয়েছে। আর মানব দেহই হচ্ছে তাদের আধ্যাত্মিক সাধনার মূল কেন্দ্র। তাই যে মানব জীবনের কল্যাণে এই মানব

দেহ পাওয়া গিয়েছে, সেই মানবজীবন বাউলদের কাছে অনেক উচ্চমূল্য বহন করে। এ সম্পর্কে লালন বলেন,

"দেব- দেবতাগণ
করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে ॥
কতো ভাগ্যের ফলে না জানি
মন রে পেয়েছে এই মানব-তরণী।
বেয়ে যাও ত্বরায় সুধারায়
যেন ভরা না ডোবে ॥
এই মানুষে হবে মাধুর্য-ভজন
তাইতো মানুষরূপ গঠলে নিরঞ্জন।" [ভট্টাচার্য, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ: ৩২৩]।

এই দেহের মধ্যেই পরমগুরু বা সাঁই বা আলেখ নূর বাস করেন। এটাই বাউল ধর্মের মূলতত্ত্ব। তাই তাঁকে পাবার জন্য কোথাও যদি খুঁজতে হয়, তবে দেহকেই অবলম্বন করতে হবে বলে বাউলদের বিশ্বাস। দেহের বাইরে মন্দির বা মসজিদ বা শাস্ত্র ইত্যাদি যেখানেই সন্ধান করা হোক না কেন, পরমতত্ত্বের সন্ধান কোন ভাবেই পাবে না [ভট্টাচার্য, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ: ৩২৭]।

বাউল মতে সাধারণ মানুষ নানা দেশ অতিক্রম করে তীর্থ করতে যায়। কিন্তু তা সবই পণ্ডশ্রম বলে বাউলরা মনে করে। কারণ যার সন্ধানে এই তীর্থ গমন, সে তো এই দেহের মধ্যেই বিরাজমান। তাইতো বাউল গানে বলা হয়,

"উপাসনা নাই গো তার
দেহের সাধন সর্ব-সার
তীর্থ-ব্রত যার জন্য
এ দেহে তার সব মিলে ॥" [ভট্টাচার্য, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ: ৩২৫]।

দেহের মধ্যে অনুসন্ধান না করে যেমন তীর্থযাত্রা করা ঠিক নয়, তেমনি দেহের বাইরে কোনো তত্ত্বের অনুসন্ধান করাও বোকামি ব্যতীত কিছুই নয়। দেহের বাইরে কোন তত্ত্ব বা সাধনার অস্তিত্ব বাউলরা স্বীকার করে না। বাউলরা বলে, যা এই ভাণ্ডে নেই, তা এই ব্রহ্মাণ্ডেও নেই। দেহাশ্রিত তত্ত্ব বা সাধনা ব্যতীত অন্যান্য তত্ত্ব বা সাধনা সম্পর্কে বাউলরা তাদের গানে বলে,

"নরদেহ নৈলে কোন তত্ত্ব নাহি জানে
সাধনের মূল এই নরদেহ গনে।।" [ভট্টাচার্য, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ: ৩৭১]

মানবদেহের এই গুরুত্বের কারণে বাউলরা বিশ্বাস করে মানব দেহের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ যা কিছু আছে, সবই গুরুত্বের অধিকারী । কোনো অংশই বর্জনীয় নয়। তাই তো মানবদেহ থেকে যা বেরিয়ে আসে, তাও বাউলরা বর্জনীয় বলে মনে করে না। তাকে ঘৃণার চোখে দেখে না। বাউল মতে দেহ সম্পর্কিত কোন কিছুই অনাবশ্যক নয়। কোন কিছুই ফেলে দেয়া উচিৎ নয় [খালেদউজ্জামান, ২০১৪: ১৫৪]।

বাউল এই মনোভাবের উপর ভিত্তি করে তাদের "চারিচন্দ্রভেদ" তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। এই চারিচন্দ্রভেদ 'কায়সাধন' বা 'সহজসিদ্ধি'র সাধনার ধারা হিসেবে যে বাউলধর্মে গৃহীত হয়েছে, তা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই [ভট্টাচার্য, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ: ২৮৯]।

বাংলার বাউল গবেষকদের মধ্যে অধিকাংশই এই "চারিচন্দ্রভেদ" সাধনার জন্য বাংলার অন্যান্য সাধক সম্প্রদায় থেকে বাউল সম্প্রদায়কে ভিন্ন বলে মত দিয়েছেন। গবেষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মনীন্দ্র মোহন বসু, শশীভূষণ দাশগুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত,উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ। নাথ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গ্রন্থ "গোরক্ষবিজয়" তে চারচন্দ্রকে 'আদিচন্দ্র', 'শ্বতচন্দ্র', 'উন্মত্তচন্দ্র' ও 'সরলচন্দ্র' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিন্তু বাউলরা এই চারিচন্দ্রের নাম দিয়েছেন শুক্র, রজঃ, বিষ্ঠা ও মূত্র [সরকার, ১৯৯২: ১৬০]। বাউলদের ভাষায় রজঃ কে রূপ বলা হয়। শুক্রকে অনেক সময় রস বলে আখ্যায়িত করা হয়। একইভাবে বিষ্ঠাকে মাটি ও মূত্রকে রস বলে। 'রতি' বলতে বাউলরা স্ত্রী-বীর্য বুঝে থাকে। কখনো আবার রজঃ কে বুঝে। আবার 'রতি' বলতে কখনো তারা ক্রিয়ার সময় উভয়ের যে মিলিত বস্তু তাকে বুঝে থাকে। সাধক সাধিকার দেহ নিঃসৃত এই চারটি বস্তু অর্থাৎ রজঃ, শুক্র, বিষ্ঠা ও মূত্রকে পান করা বা গ্রহণ করাকে চারিচন্দ্রভেদ বলে বাউলরা আখ্যায়িত করে [ভট্টচার্য, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ: ৪২৪]।

ক্ষিতি বা মাটি, অপ বা পানি , তেজঃ বা সূর্য, মরুৎ বা বায়ু এবং ব্যোম বা আকাশ- এই পঞ্চভূতকে বা পাঁচটি উপাদানকেই অনেক মনীষী সৃষ্টির মূল উপাদান বলে মনে করেন। বাউলরা বিষ্ঠাকে ক্ষিতির, মূত্রকে অপ-এর, তেজঃ কে রজঃ-এর এরং মরুৎকে শুক্রের প্রতীক বলে মনে করে। সাধক সাধিকারা তাই অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে চারিচন্দ্র গ্রহণ করে। তারা নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং নির্বিকার চিত্তে এই চারিচন্দ্র গ্রহণ করে থাকে। সাধক সাধিকারা একই সাথে গ্রহণ করে থাকে। এতে তাদের মধ্যে কোন কুণ্ঠা স্থান পায় না। চারিচন্দ্র গ্রহণে বাউলদের মধ্যে কোন ভয় কাজ করেনা। তাদের মনে কোন ঘৃণারও জন্ম নেয় না। এগুলো অন্তরে স্থান দিলে যে তারা দূর্বল হয়ে যাবে, সে বিষয়ে তারা ওয়াকিবহাল। কারণ লজ্জা, ঘৃণা, ভয় যদি থাকে তবে সাধন সম্ভব নয়। তাই এই তিনটি অনুভূতিকে বর্জন করেই তারা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এবং আনন্দের সাথে চারিচন্দ্র গ্রহণ করে। এই চারিচন্দ্র গ্রহণের সময় তারা মন্ত্রপাঠ করে। প্রতিটি চন্দ্র গ্রহণের জন্য মন্ত্র আছে। তবে এই মন্ত্রপাঠ সবসময় একই হয় না। স্থানভেদে এবং গুরুভেদে এই মন্ত্রের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বাউলরা এই মন্ত্রগুলিকে বীজ মন্ত্র বলে আখ্যায়িত করে [ভট্টচার্য, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ: ৪২৪, ৪২৫]।

বাউলরা কখনো কখনো মূলাধারের রজঃকে ফুল, শুক্রকে ক্ষীর এবং নিঃসৃত রজঃকে নীর বলে। তাদের মতে, এই রজো-বীজে বা নীড়ে-ক্ষীরেই মিশে রয়েছে সহজ মানুষ।এজন্য বাউল সাধক নারী রজঃ এবং বাউল সাধিকা পুরুষের শুক্র পান করে [শরীফ, ২০১৩: ৪৩]। বাউলরা মনে করেন, দেহের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য নাড়ী। এইসব নাড়ীর মধ্যে প্রধান তিনটি নাড়ী হচ্ছে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। এ তিনটি প্রধান নাড়ীকে গঙ্গা, যমুনা ও স্বরস্বতী নামেও ডাকা হয়। বাউলরা বলে, এই তিনটি নাড়ীকে যদি মহানদী মনে করা হয়, তবে অন্যসব অর্থাৎ অন্যান্য নাড়ীগুলি হবে উপনদী বা স্রোতোস্বিনী। তাদের মতে, এগুলো দিয়েই শুক্র, রজঃ, নীর, ক্ষীর, রক্ত প্রবাহমান। এই প্রবাহ বায়ু দ্বারা চালিত। তাই বাউলরা বিশ্বাস করে,

বায়ু নিয়ন্ত্রণের শক্তি অর্জন করলেই দেহের উপর কর্তৃত্ব জন্মায় [শরীফ, ২০১৩: ৪৬]। লালন শাহী ও পাঞ্জশাহী ফকির সম্প্রদায়ের সদস্যগণ চারিচন্দ্রকে ভিন্ন নামে নামকরণ করে। তারা শুক্রকে 'নিজ', রজঃ কে 'অনুমাত', মূত্র কে 'নিমাত' ও বিষ্ঠাকে 'রামাত' নামে অভিহিত করে। তাদের মতে, চারিচন্দ্র বলতে আমরা যা বুঝি তা এই দেহেরই উপাদান। এই দেহেরই চারটি উপাদান যখন দেহের মধ্যেই গ্রহণ করা হয়, তখন দেহের মধ্যে একটি পরিবর্তন সাধিত হয় বলে বাউলরা মনে করে। অধিকাংশ বাউল সাধকদের মতে, চারিচন্দ্র গ্রহণে সাধক সাধিকা উভয়ের দেহই পরিপক্ক হয়। দেহের মধ্যে একটি স্থির, চঞ্চলহীন শক্তির সঞ্চার হয়। দেহ ভাবযোগ্য হয়েছে কিনা অর্থাৎ বাউলদের যে ভাব সাধনা বা প্রেমমূলক যে যোগ-মিলন-ক্রিয়া তার উপযোগী হয়েছে কিনা তা এই চারিচন্দ্রভেদ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বোঝা যায়। চারিচন্দ্র গ্রহণের স্বাদের দ্বারা এই পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয় [ভট্টাচার্য ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ: ৪২৪, ৪২৫]। বাউল সাধক এই অভিমত দেন যে, প্রাকৃত দেহ অপ্রাকৃতে পরিণত হচ্ছে কিনা, জড়দেহ পাকা বা সিদ্ধদেহে রূপান্তরিত হচ্ছে কিনা এবং রূপ হতে স্বরূপ অর্থাৎ ভাবদেহে সাধক কতটুকু উন্নত হচ্ছে, এসবেরই পরীক্ষার জন্য সাধকের সাধনার অঙ্গ হিসেবে চারিচন্দ্রভেদ প্রয়োজন [ভট্টাচর্য, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ: ৫৭]। সাধারণ মানুষ চারিচন্দ্র গ্রহণের যে মর্ম তা উপলব্ধি করতে পারে না। চারিচন্দ্র গ্রহণে যে সাধক অটল থকে, যার উর্ধ্বে গমনের ইচ্ছা রয়েছে, একমাত্র সেই এই ক্রিয়ার মূল্য উপলব্ধি করতে পারে। লালন বলেন,

> "সবায় কি তার মর্ম জানতে পায়।
> জানে ভজন- সাধন করে
> যে সাধকে অটল হয় ॥" [ভট্টাচার্য, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ: ৩৯৫]।

বাউলরা এই ক্রিয়াগুলি সাধারণত পনের দিন পর পর করে থাকে। তারা হয় কেবল রজঃ বা রজঃ ও শুক্র উভয়ই মিলিত অবস্থায় পান করে। বাউলদের মধ্যে যারা মিলিত বস্তু পান করে না, তারা কেবল রজঃ পান করে। রজঃ পানের পনের দিন অন্তর মাটি ও রস পান করে। এছাড়াও যারা এই মিলিত বস্তু পান করেনা, তিনমাস বা ছয়মাস বা একবছর পর পর সাধিকার জিহ্বার মাধ্যমে মোক্ষিত শুক্র পান করে। এই সমস্ত পান-ক্রিয়া সাধক-সাধিকা উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য [ভট্টাচার্য, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ: ৪২৯]।

বাউলদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতির সংমিশ্রন রয়েছে। হিন্দু জাতির বাউলদের জন্য চারচন্দ্রভেদ অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করা হয়। এই শ্রেণীর সমস্ত সাধকই এই অনুষ্ঠান করে থাকে। পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, 'ভেদ' অর্থ পান করা বা গ্রহণ করা। বৈষ্ণব বাউল, রসিক বৈষ্ণব, বাউল মোহান্ত ও হিন্দু বাউলরা অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে এই সাধনা করে থাকে। এই সাধনা তিন দিনের। তারা সাধনা করতে গিয়ে ত্রিবেণীর ঘাট বন্দনা করে। প্রথম দিনের প্রথম অংশে তারা পান ক্রিয়ার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। সেখানে কখনো কখনো তারা দুই বস্তু অর্থাৎ শুক্র ও রজঃ একসাথে মিশ্রিত করে পান করে। দ্বিতীয় দিনের পান ক্রিয়া গুরুভেদে বা সম্প্রদায়ভেদে অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় দিনে পান ক্রিয়া অনুষ্ঠান বন্ধ থাকে। মুসলিম বাউল সাধকরা ভেদ অর্থে পান ক্রিয়া করে না [সরকার, ১৯৯২: ১৬১]। ফকীর, দরবেশ ইত্যাদি নামে পরিচিত মুসলমান সাধকদের রচনায় চন্দ্রভেদ কথা আছে। তবে তারা তা সরাসরি নয় বরং রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন [সরকার, ১৯৯২: ১৬২]।

বাউল সাধক সাধিকাদের সাধন জীবনের প্রাথমিক অবস্থা থেকেই প্রত্যেকের এই পান করা বা ভেদ অবশ্যই পালনীয় একটি নিয়ম। যদিও সম্প্রদায়ভেদে ও গুরুভেদে এর পদ্ধতির মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথম দুই চন্দ্রের অর্থাৎ শুক্র ও রজঃ মিলে একটি ভেদ পদ্ধতি আছে বলে বাউলরা স্বীকার করে, যাকে 'রস-রতির মিলন' বলে অভিহিত করা হয়। লালনশাহী ফকিরগণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে এই মিলনের অনুষ্ঠান করে থাকে। অন্যদিকে নবদ্বীপ ও রাঢ়ের বাউলগণ অন্যসময় এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। তবে প্রত্যেকের জন্যই এই সাধনক্রিয়া পালনীয়। কারণ বাউল সাধনায় এই ক্রিয়া একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচিত। সাধকের সাধনার অগ্রগতি ও ফল বিবেচনা করে গুরু পর্যায়ক্রমে উপদেশ দানের মাধ্যমে সাধককে চন্দ্রভেদ শিক্ষা দেন। কোন শ্রেণীর সাধকের জন্য এই শিক্ষা প্রয়োজন এবং সাধনায় কোন স্তরে প্রয়োজন, তা একমাত্র গুরুর বিবেচনা ও আদেশ এর উপর নির্ভর করে [ভট্টাচার্য, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ: ৫৭]।

এইসব ক্রিয়া অত্যন্ত গুহ্য ব্যাপার বিধায় সাধকেরা কিছুতেই তা সাধারণের সামনে প্রকাশ করে না। তাই লিখিত কোন গ্রন্থে এইসব ক্রিয়ার উল্লেখ না থাকাটাই বেশি স্বাভাবিক। বাউল সাধনায় এই চারিচন্দ্রভেদ সাধনা অপরিহার্য। তবু তারা প্রকাশ্যে এই সাধনার কথা খুব কমই প্রকাশ করেছে। কদাচিৎ তারা দু'একটি গানে এ সম্পর্কে সংকেত দিয়েছে। তাও শুধুমাত্র রজঃ ও শুক্র গ্রহণ সম্পর্কে, বিষ্ঠা ও মূত্র গ্রহণের কোন প্রকাশ্যে উল্লেখ নেই। এমনকি সাংকেতিক বা রূপকাশ্রয়ী উল্লেখও নেই। বাউলরা তাদের সাধন সম্পর্কে যে সব গানে ধারণা দিয়েছে বা গান রচনা করেছে, তার মধ্যে কেবল একটি গানে চারিচন্দ্রভেদের প্রত্যক্ষ উল্লেখ আছে,

"চারচন্দ্রের নিরূপণ, জান গা মন তার বিবরণ,
জানলে পরে জীবদেহেতে ঘুচে যেত কুমতি ॥"
[ভট্টাচার্য, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ: ৪২৯]।

পর্যালোচনা : মানবতাবাদ শব্দটির অর্থকে যদি সংক্ষেপে প্রকাশ করতে চাই তবে বলতে হয়, মানুষের প্রাধান্য স্বীকার করে যা তাই মানবতাবাদ। অর্থাৎ তত্ত্ব, ক্রিয়া, বিশ্বাস প্রভৃতি যাই হোক না কেন, তা যদি নিঃসংকোচে মানুষের-প্রাধান্য স্বীকার করে তবে তা মানবতাবাদের অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে। একথার ভিত্তি ধরে বলতে পারি, বাউল দর্শন মানবতাবাদী- এ কথা উপলক্ষে যে তিনটি বাউল সাধনা নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করা হয়েছে তা কতটা মানব-প্রাধান্য স্বীকার করে তা পর্যালোচনার দাবি রাখে।

বাউলদের যে শাস্ত্র-বিমুখ মনোভাব বা বেদ-বিরোধী চিন্তা, তার মধ্যেই মানব-প্রাধান্য খুঁজে পাওয়া যায়। বাউলরা শাস্ত্র বা বেদ বা তত্ত্বের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে মানব-প্রাধান্য স্বীকার করে বলেই। শাস্ত্র বিরোধিতার কারণ সমূহকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই তার মধ্যেই মানব-প্রাধান্য নিহিত। মানুষের গুরুত্ব স্বীকার করে বলেই বাউলরা শাস্ত্রের চেয়ে মানুষের ভজনকেই বেশি প্রাধান্য দেয়। তারা স্বীকার করে মানুষের দেহকে কেন্দ্র করে যে সাধনা, তাই শ্রেষ্ঠতম। চরম সত্যের সন্ধান যদি মানুষ পেতে চায়, তবে তা শাস্ত্রের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং তার জন্যও মানুষের দ্বারস্থ হতে হবে। শাস্ত্র বর্জনীয়, কারণ তা মানুষের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। সাম্প্রদায়িক মনোভাব জাগ্রত করে। পাশাপাশি শাস্ত্রে বর্ণিত বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতাকে বাউলরা অপ্রয়োজনীয় মনে করে। কারণ তা মানুষের জন্য

অপ্রয়োজনীয়। তাছাড়া যে পরমকে পাবার উপলক্ষ্য হিসেবে শাস্ত্র বা এসব আনুষ্ঠানিকতার কথা বলা হয়, সেই পরমের বিচরণ ক্ষেত্রও তো মানুষ। শাস্ত্র মানুষের কোনো প্রশ্নের সঠিক উত্তরও দিতে পারে না। মানুষের মর্যাদা পূর্বের শাস্ত্রগুলোতে লজ্ঘিত হয়েছে, নতুন কোন শাস্ত্র রচিত হলে তাতেও লজ্ঘিত হতে পারে। তাই বাউলরা নিজস্ব কোনো শাস্ত্রই রচনা করেনি। এমনকি তাদের মতে, মানুষের কাজও নয় শাস্ত্র রচনা করা। শাস্ত্র জানার চেয়ে মানুষকে জানার উপর তারা অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। তাই আমরা বলতেই পারি, বাউলদের শাস্ত্র-বিমুখতার মধ্যে মানবকে প্রাধান্য দানের মনোভাব নিহিত আছে।

গুরুবাদ নামক বাউল সাধনায়ও মানব-প্রাধান্যের কথা খুঁজে পাওয়া যায়। ভারতের প্রচলিত ধর্মীয় ধারা ও অন্যান্য যোগ-তান্ত্রিক ও গূঢ় তত্ত্বানুসন্ধানী সম্প্রদায়ের প্রভাবজাত গুরুবাদ বাউল সাধনায় পরিলক্ষিত হলেও মানব-প্রাধান্য গুরুবাদকে নিজস্বতা দান করেছে। বাউল সাধনায় মানবগুরুর প্রাধান্য অপরিসীম। গুরুর পরমরূপ থাকলেও, মানব গুরুই তাদের কাছে বেশি গুরুত্বের অধিকারী। কারণ পরম গুরু প্রকাশিত হয় এই মানব গুরুর মধ্যে। অর্থাৎ পরম গুরু বা পরম তত্ত্বকে পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে মানবগুরু। শুধু তাই নয়, বাউল সাধনার প্রতি-স্তরে মানব গুরুর সান্নিধ্য তাদের প্রয়োজন। গুরু ব্যতীত তাদের সাধনা অসম্ভব। গুরুর কাছে কিছুই অপ্রকাশিত থাকে না। গুরুই তাদের সঠিক পথের দিশারী। পরমতত্ত্বের স্বরূপ রূপে যে পরম সম্পদ রক্ষা করা বাউল সাধনায় গুরুত্বপূর্ণ, সেই পরম সম্পদ রক্ষার যথার্থ পথও বাতলে দেন মানব গুরু। এ জন্য সাধকের অন্তরে যে আত্মোপলব্ধি জাগ্রত করা প্রয়োজন, তারও সহায়ক হচ্ছেন মানব গুরু। অর্থাৎ বাউল সাধনার প্রতিটি ক্রিয়ায়, প্রতিটি স্তরে বাউলকে সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য গুরু হিসেবে মানুষকে প্রয়োজন। কোন অলৌকিক বা ঐশী শক্তির নয়। যদি অলৌকিক কোন শক্তি থাকেও, তারও প্রকাশ নিহিত থাকে সেই মানব গুরু তথা মানুষের মাঝেই। তাই বাউল গুরুবাদেও যে মানব-প্রাধান্য স্বীকার করা হয়, তা মেনে নিতেই হবে।

মানব-প্রাধান্যের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে বাউল চারিচন্দ্রভেদ সাধনা। বিভিন্ন ব্যক্তিচিন্তা ও তত্ত্বের মধ্যে মানব-প্রাধান্য তথা মানবতাবাদ পরিলক্ষিত হলেও, চারিচন্দ্রভেদ সাধনা সেসব থেকে বাউলদের স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরীতে সাহায্য করেছে। মানবের স্থান বাউলদের নিকট কতোটা উর্ধ্বে, তা চারিচন্দ্রভেদ সাধনা প্রকাশ করেছে। চারিচন্দ্রভেদ সাধনা পুরোটাই মানব দেহকেন্দ্রীক। বাউলদের বিশ্বাস, আলেখ-সাঁই বা পরমতত্ত্বের বাস অন্য কোথাও নয়, বরং এই মানব দেহে। মানবদেহ তাই অনেক গুরুত্বের অধিকারী। সেইসঙ্গে মানব দেহ থেকে নিঃসৃত সকল কিছুই গুরুত্বপূর্ণ। চারিচন্দ্র বা রজঃ, শুক্র, বিষ্ঠা, মূত্র যেহেতু মানব দেহ থেকে নিঃসৃত, তাই তা বাউলদের কাছে বর্জনীয় নয়। তারা তাদের সাধনার পূর্ণতার জন্য, দেহের পরিপক্কতার জন্য, দেহ সাধনের জন্য তৈরি কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য অনুষ্ঠান পালনের মধ্যে দিয়ে নিঃসঙ্কোচে চারিচন্দ্র গ্রহণ বা পান করে। যা সাধারণের কাছে বর্জনীয়, ঘৃণার বস্তু তা বাউলরা কুণ্ঠাহীনভাবে গ্রহণ করে শুধুমাত্র তা মানব দেহ নিশ্রিত বলেই। যদি কেউ বলতে চায় পরমতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া বাউলদের কাছে মূখ্য বিষয়, তবে বলতে হয় সেই সন্ধানও তো করতে হবে মানব দেহেই। তাই এই মানব দেহও বাউলদের নিকট গৌণ নয়, মূখ্য। তার প্রমাণ এই চারিচন্দ্রভেদ সাধনা। মানব-প্রাধান্যের যে এক অতুলনীয় উদাহরণ বাউল চারিচন্দ্রভেদ সাধনা সৃষ্টি করেছে, তা মেনে নিতে সংকোচ করার কোন কারণ নেই।

উপরোক্ত তিনটি সাধনা থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বাউলরা মানবতাবাদী। কারণ মানবতাবাদের যে সংজ্ঞা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি, তার সাথে সাধনাগুলো সঙ্গতিপূর্ণ। বাউলরা কোন কিছুর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, জোরপূর্বক তাদের সাধনায় লিপ্ত হয় না। বরং তারা তাদের নিজস্ব ইচ্ছায় এইসব সাধনা করে। তারা নিজেরাই ঠিক করে তারা তাদের জীবনকে কোন দিকে, কোন লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করবে এবং কাকে মূল্য দিবে। সাধনা তাদের কাছে যদি ধর্মীয় আচারও হয়, তবে সে আচার চিরায়ত ধর্মীও আচারের মতো নয়। সেখানে কোন জোর নেই। নেই কোন পুথিগত নির্দেশনা। সর্বোপরি কোন অলৌকিকতা নয়, বরং প্রত্যক্ষ উপস্থিত দেহকে আশ্রয় করে সাধনা, যা সম্পূর্ণ বাউলের নিজস্ব। প্রোটোগোরাসের মতো বাউল সম্প্রদায়ও মানুষকেই সবকিছুর পরিমাপক মনে করে। সেটাই তাদের সাধনায় দেখতে পাই। তাই বাউল সাধনায় যে মানবতার গান গাওয়া হয়, তা নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

মূল্যায়ন: বাউল সাধনায় মানব-প্রাধান্য সম্পর্কে উপরোক্ত আলোচনা থেকে যে ধারণা আমরা পাই তা থেকে বলা যায়, বাউলরা পরমকে খুঁজতে যেয়ে মানুষকে ভুলে যায়নি, বরং মানুষের মধ্যেই পরমের আবাস তৈরী করেছে। বাউল সাধনার মর্মবাণী হচ্ছে সীমার মধ্যে অসীমের সন্ধানে লিপ্ত হওয়া [তালিব, ১৯৬৮:১২১]। অর্থাৎ অসীম বা পরমতত্ত্বের সন্ধান বাউলরা করে। কিন্তু তা করে সসীম বা মানুষের মধ্যে। তাদের লক্ষ্য অর্জনের উপায় হচ্ছে মানুষ। এই মানবের মাঝেই সব বিদ্যমান। মানব ব্যতীত অন্য কোথাও সন্ধান অর্থহীন। মানব-প্রাধান্যের, সর্বোপরি মানবতার এই বার্তাই বাউলরা প্রচার করে তাদের সাধনার মাধ্যমে। শাস্ত্র-বিমুখতা বা গুরুবাদ বা চারিচন্দ্রভেদ - যে সাধনাই হোক না কেন, মানুষই সেখানে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে আছে। বিশেষভাবে চারিচন্দ্রভেদ সাধনার মাধ্যমে মানব-প্রাধান্যের যে অনন্য নজির বাউলরা স্থাপন করেছে, তা বিরল। মানব-প্রাধান্যের এই অসাধারণ দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে মানব প্রেমের পরম বহিঃপ্রকাশ বাউলরা ঘটিয়েছে। এতে করে বাউল সাধনায় যে মানবতাবাদ মিশে আছে, তাই প্রতিফলিত হয়।

উপসংহার: প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার এই যান্ত্রিক যুগে আমাদের চারপাশে মানবতা আজ নিষ্পেষিত। মানব মর্যাদা লঙ্ঘন আজ সাধারণ চর্চিত বিষয়। মানবাধিকার বন্দি স্বার্থকেন্দ্রীকতায়। যেই মানবতাবোধ মানব শান্তি রক্ষার জন্য ও মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য, আজ তা পরম কাঙ্খিত। মানব মর্যাদা রক্ষার সেই মানবিকতার গান বাউলরা গেয়ে বেড়িয়েছেন বাংলার পথে-প্রান্তরে, শিক্ষা দিয়েছেন তাদের সাধনার মাধ্যমে। এসবের সমন্বয়ে গড়ে উঠা বাউল দর্শন যে মানবতাবাদী, তা নিয়ে আজ আর সন্দেহ নেই। মানব মর্যাদা রক্ষায় ও উন্নয়নে বাউল মানবতাবাদ আজ আমাদের পাথেয় হতে পারে। সে জন্যই বাউল দর্শনে বিদ্যমান মানবতাবাদ আজ আমাদের জন্য অনুসরণীয় এবং বাঙালির জীবন চর্চায় এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে গৃহীত হবার দাবি রাখে।

তথ্যনির্দেশ :

আমিনুল ইসলাম, “বৈষ্ণব দর্শন ও মানবতাবাদ”, ওয়াকিল আহমদ সম্পাদিত, *বাঙালীর দর্শন চিন্তা*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৯৫-১১০।

আহমদ শরীফ, *বাউল তত্ত্ব*, পড়ুয়া, শাহবাগ, ঢাকা, ২০১৩।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ।

মুহম্মদ আবু তালিব, *লালন শাহ ও লালন গীতিকা*, প্রথম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮।

মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সূফী প্রভাব*, র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১৫।

মো: খালেদউজ্জামান, *লালন দর্শনে মানবতাবাদ*, নভেল পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০১৪।

মো: সোলায়মান আলী সরকার, *বাংলার বাউল দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২।

রামদুলাল রায়, বাঙ্গালির দর্শন, সুরভী পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১৭।

হাসনা বেগম, "বাউল দর্শন", ওয়াকিল আহমদ সম্পাদিত, *বাঙালীর দর্শন চিন্তা*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১১১-১২৮।

Andrew Copson, "What is Humanism?", Edited by Andrew Copson and A. C. Grayling, *The Wiley Blackwell Handbook of Humanism*, John Wiley and Sons Ltd., New Jersey, 2015, P. 1-33.

Bertrand Russell, *History of Western Philosophy*, Routledge, New York, 1996.

Corliss Lamont, *The Philosophy of Humanism*, Humanist Press, New York, 1997.